# কালের যাত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

# উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
৫৭ বছর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে
কবির সস্নেহ উপহার।

৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯

## সূচী

১। রথের রশি

২। কবির দীক্ষা
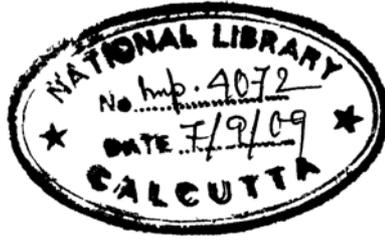
# কালের যাত্রা

## রথের রশি

রথযাত্রার মেলায় মেয়েরা

১মা

এবার কী হোলো ভাই।
উঠেচি কোন্ ভোরে, তখন কাক ডাকেনি।
কঙ্কালিতলার দিঘিতে হুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল ;
রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।

২য়া

চারিদিকে সব যেন থমথমে হয়ে আছে,
ছম্‌ছম্‌ করচে গা।

৩য়া

দোকানী পসারিরা চুপ চাপ বসে,
কেনাবেচা বন্ধ। রাস্তার ধারে ধারে
লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে
কখন আসবে রথ। যেন আশা ছেড়ে দিয়েচে।

১মা

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ,
বেরবেন ব্রাহ্মণ ঠাকুব শিষ্য নিয়ে,

বেরবেন রাজা, পিছনে চল্‌বে সৈন্যসামন্ত,—
পণ্ডিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চল্‌বে পুঁথিপত্র হাতে।
কোলের ছেলে নিয়ে মেয়েরা বেরবে
ছেলেদের হবে প্রথম শুভযাত্রা,
কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে।

২য়া

ঐ দেখ্ পুরুতঠাকুর বিড়বিড় করচে ওখানে।
মহাকালের পাণ্ডা বসে মাথায় হাত দিয়ে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্ব্বনাশ এলো।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

১মা

এ কী অকল্যাণের কথা ঠাকুর।
উৎসবে এসেচি মহাকালের মন্দিরে—
আজ রথযাত্রার দিন।

সন্ন্যাসী

দেখতে পাচ্চ না, আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের ক্ষেতে বাসা করেচে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেচে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্চ না, লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র,
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্চে মরুভূমিতে—
ফল্‌চে না কোনো ফল।

৩য়া

হাঁ ঠাকুর তাইতো দেখি।

সন্ন্যাসী

তোমরা কেবলি করেচ ঋণ,
কিছুই করোনি শোধ,
দেউলে কবে দিয়েচ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

১মা

তাই তো, বাপ্‌রে, গা শিউরে ওঠে—
এ যে অজগর সাপ, খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে আর
নড়ে না।

সন্ন্যাসী

ঐ তো রথের দড়ি, যত চলে না ততই জড়ায়।
যখন চলে, দেয় মুক্তি।

২য়া

বুঝেচি আমাদের পূজো নেবেন বলে
হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা। পূজো পেলেই
হবেন তুষ্ট।

২য়া

ও ভাই, পূজো তো আনি নি। ভুল হয়েচে।

৩য়া

পূজোর কথা তো ছিল না,—
ভেবেছিলেম রথের মেলায় কেবল বেচব কিনব,
বাজি দেখব যাদুকরের,
আর দেখব বাঁদর নাচ।

চল্ না শীগ্‌গির, এখনো সময় আছে,
আনিগে পূজো।

[ সকলের প্রস্থান।

নাগরিকদের প্রবেশ

১ম নাগরিক

দেখ্ দেখ্‌রে, রথের দড়িটা কেমন করে পড়ে আছে।
যুগযুগান্তরের দড়ি, দেশ দেশান্তরের হাত পড়েচে
ঐ দড়িতে,
আজ অনড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে,
সর্ব্বাঙ্গ কালো করে।

২ নাগরিক

ভয় লাগচে রে। সরে দাঁড়া, সবে দাঁড়া।
মনে হচ্চে ওটা এখনি ধরবে ফণা, মারবে ছোবল।

৩ নাগরিক

একটু একটু নড়চে যেন রে। আঁকুঁবাকু করচে বুঝি।

১ নাগরিক

বলিস্‌নে অমন কথা। মুখে আন্‌তে নেই।
ও যদি আপনি নড়ে তা হলে কি আর রক্ষে আছে।

৩ নাগরিক

তাহলে ওর নাড়া খেয়ে সংসারের সব জোড়গুলো
বিজোড় হয়ে পড়বে। আমরা যদি না চালাই
ও যদি আপনি চলে, তা হলে পড়ব যে চাকার তলায়।

১ নাগরিক

ঐ দেখ্ ভাই, পুরুতের গেছে মুখ শুকিয়ে,
কোণে বসে বসে পড়চে মন্তর।

২ নাগরিক

সেদিন নেই রে,
যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।

৩ নাগরিক

তবু আজ ভোরবেলা দেখি ঠাকুর লেগেচেন টান দিতে,—
কিন্তু একেবারেই উল্টো দিকে, পিছনের পথে।

১

সেটাই তো ঠিক পথ, পবিত্র পথ, আদি পথ।
সেই পথ থেকে দূরে এসেই তো কালের মাথার ঠিক
থাক্‌চে না।

২

মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠলি দেখি। এত কথা শিখলি কোথা।

১ নাগরিক

ঐ পণ্ডিতেরই কাছে। তাঁরা বলেন
মহাকালের নিজের নাড়ীর টান পিছনের দিকে,
পাঁচজনের দড়ির টানে অগত্যা চলেন সামনে।
নইলে তিনি পিছু হটতে হটতে একেবারে পৌঁছতেন
অনাদি কালের অতল গহ্বরে।

৩ নাগরিক

ঐ রশিটার দিকে চাইতে ভয় করে।
ওটা যেন যুগান্তের নাড়ী—
সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দবদব করচে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

**সন্ন্যাসী**

সর্ব্বনাশ এল।

গুরু গুরু শব্দ মাটির নীচে।
ভূমিকম্পের জন্ম হচ্চে।
গুহার মধ্য থেকে আগুন লকলক মেলচে রসনা।
পূর্ব্বে পশ্চিমে আকাশ হয়েচে রক্তবর্ণ।
প্রলয় দীপ্তির আঙটি পরেচে দিক্‌চক্রবাল। [ প্রস্থান।

১ নাগরিক

দেশে পুণ্যাত্মা কেউ নেই কি আজ।
ধরুক না এসে দড়িটা।

২ নাগরিক

এক একটি পুণ্যাত্মাকে খুঁজে বের করতেই এক এক যুগ যায় বয়ে,—
ততক্ষণ পাপাত্মাদের হবে কী দশা।

৩ নাগরিক

পাপাত্মাদের কী হবে তা নিয়ে ভগবানের মাথা-ব্যথা নেই।

২ নাগরিক

সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই।
তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়।
পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে,
আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গলে গুহায়।

১ নাগরিক

দড়িটার রং যেন এল নীল হয়ে।
সামলে কথা কোস্‌।

মেয়েদের প্রবেশ

১মা

বাজা ভাই, শাঁখ বাজা—

রথ না চল্‌লে কিছুই চলবে না।
চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।
এরি মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরী,
তার বৌটা শুষচে জ্বরে। কপালে কী আছে জানিনে।

১ নাগরিক

মেয়ে মানুষ, তোমরা এখানে কী করতে।
কালের রথযাত্রায় কোনো হাত নেই তোমাদের।
কুট্‌নো কোটো গে ঘরে।

২য়া

কেন, পূজো দিতে তো পারি।
আমরা না থাকলে পুরুতের পেট হত না এত মোটা।
গড় করি তোমায় দড়ি-নারায়ণ। প্রসন্ন হও।
এনেচি তোমার ভোগ। ওলো ঢাল্‌ ঢাল্‌ ঘি,
ঢাল্‌ দুধ, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়,
ঢেলে দে না জল। পঞ্চগব্য রাখ্‌ ঐখানে,
জ্বালা পঞ্চপ্রদীপ। বাবা দড়ি-নারায়ণ,
এই আমার মানৎ রইল, তুমি যখন নড়বে
মাথা মুড়িয়ে চুল দেবো ফেলে।

৩য়া

এক মাস ছেড়ে দেবো ভাত, খাবো শুধু রুটি।
বলো না ভাই সবাই মিলে, জয় দড়ি-নারায়ণের জয়।

১ম নাগরিক

কোথাকার মূর্খ তোরা—
দে মহাকালনাথের জয়ধ্বনি।

১মা

কোথায় তোমাদেব মহাকালনাথ? দেখিনে তো চক্ষে।

দড়ি প্রভুকে দেখচি প্রত্যক্ষ,—
হনুমান প্রভুর লঙ্কা-পোড়ানো ল্যাজখানার মতো,—
কী মোটা, কী কালো, আহা দেখে চক্ষু সার্থক হোলো।
মরণকালে ঐ দড়ি-ধোওয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো
আমার মাথায়।

২য়া

গালিয়ে নেবো আমার হার, আমার বাজুবন্দ,
দড়ির ডগা দেবো সোনা বাঁধিয়ে।

৩য়া

আহা কী সুন্দর রূপ গো।

১মা

যেন যমুনা নদীর ধারা।

২য়া

যেন নাগকন্যার বেণী।

৩য়া

যেন গণেশ ঠাকুরের শুঁড় চলেচে লম্বা হয়ে,
দেখে জল আসে চোখে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

১মা

দড়ি-ঠাকুরের পূজো এনেচি ঠাকুর।
কিন্তু পুরুত যে নড়েন না, মন্তর পড়বে কে।

সন্ন্যাসী

কী হবে মন্তরে।
কালের পথ হয়েচে দুর্গম।
কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও গভীর গর্ত্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

৩য়া

বাবা, সাতজন্মে শুনিনি এমন কথা।

চিরদিনই তো উঁচুর মান রেখেচে নীচু, মাথা হেঁট করে।

উঁচু নীচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।

সন্ন্যাসী

দিনে দিনে গর্ত্তগুলোর হাঁ উঠচে বেড়ে।

হয়েচে বাড়াবাড়ি. সাঁকো আর টিঁকচে না।

ভেঙে পড়ল বলে।

[ সন্ন্যাসীব প্রস্থান।

১মা

চল ভাই, তবে পূজো দিইগে রাস্তাঠাকুরকে।

আর গর্ত্ত প্রভুকেও তো সিন্নি দিয়ে করতে হবে খুসি,

কী জানি ওঁবা শাপ দেন যদি। একটি আধটি তো নন্,

আছেন হু-হাত পাঁচ-হাত অন্তর।

নমো নমো দড়ি ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর,

ঘরে আছে ছেলে পুলে।

[ মেয়েদের প্রস্থান।

সৈন্যদলের প্রবেশ

১ সৈনিক

ওবে বাস্‌রে। দড়িটা পড়ে আছে পথেব মাঝখানে—

যেন একজটা ডাকিনীর জটা।

২ সৈনিক

মাথা দিল হেঁট করে।

স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত আমরাও ছিলুম পিছনে।
একটু ক্যাচকোঁচও করলে না চাকাটা।

সৈনিক

ও যে আমাদের কাজ নয় তাই।
ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু।
চিরদিন আমরা চড়েই এসেচি রথে
চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা—যাদের নাম করতে নেই।

১ নাগরিক

শোনো ভাই, আমার কথা।
কালের অপমান করেচি আমরা, তাই ঘটেচে এ সব
অনাসৃষ্টি।

৩ সৈনিক

এ মানুষটা আবার বলে কী!

১ নাগরিক

ত্রেতা যুগে শূদ্র নিতে গেল ব্রাহ্মণের মান,
চাইলে তপস্যা করতে, এত বড়ো আস্পর্দ্ধা,
সেদিনও অকাল লাগল দেশে, অচল হোলো রথ।
দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা,
তবে তো হোলো আপদ শান্তি।

২ নাগরিক

সেই শূদ্ররা শাস্ত্র পড়চেন আজকাল,
হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন,আমরা কি মানুষ নই।

৩ নাগরিক

মানুষ নই! বটে! কতই শুনব কালে কালে।
কোন্‌দিন বলবে ঢুকব দেবালয়ে।
বলবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে নাইব এক ঘাটে।

১ নাগরিক

এর পরেও রথ যে চলচে না, সে আমাদের প্রতি
দয়া করে।
চল্‌লে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

১ সৈনিক

আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র,
কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্ব্বনাশ।

২ সৈনিক

চল্‌না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি
ওরাই মানুষ না আমরা।

২ নাগরিক

এদিকে আবার কোন্ বুদ্ধিমান বলেচে রাজাকে,
কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র,
চলে কেবল স্বর্ণচক্র। তিনি ডাক দিয়েচেন শেঠজিকে।

১ সৈনিক

রথ যদি চলে বেনেব টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেবো ডুব।

২ সৈনিক

দাদা, রাগ করো মিছে, সময় হয়েচে বাঁকা।
এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও
বেনেব টানেই দেয় মিঠে সুরে টঙ্কার।
তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আন্‌লে
ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

৩ সৈনিক

তা সত্যি। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে
পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্দ্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্ত্তি।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

১ সৈনিক

এই যে সন্ন্যাসী, রথ চলে না কেন আমাদের হাতে।

সন্ন্যাসী

তোমরা দড়িটাকে করেচ জর্জ্জর।

যেখানে যত তীর ছুঁড়েচ বিঁধেচে ওর গায়ে।

ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েচে বাঁধনের জোর।

তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,

বলের মাৎলামিতে দুর্ব্বল করবে কালকে।

সরে যাও সবে যাও ওর পথ থেকে।

প্রস্থান।

ধনপতির অনুচরবর্গ

১ম ধনিক

এটা কী গো, এখনি হুঁচট খেয়ে পড়েছিলুম।

২য় ধনিক

ওটাই তো রথের দড়ি।

৪র্থ ধনিক

বীভৎস হয়ে উঠেচে, যেন বাসুকি মরে উঠল ফুলে।

১ সৈনিক

কে এরা সব ?

২ সৈনিক

আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো

লাফিয়ে লাফিয়ে পড়চে চোখে।

১ নাগরিক

ধনপতি শেঠির দল এরা।

১ ধনিক

আমাদের শেঠজিকে ডেকেচেন রাজা।
সবাই আশা করচে তাঁর হাতেই চলবে রথ।

২ সৈনিক

সবাই বলতে বোঝায় কাকে বাপু।
আর তারা আশাই বা করে কিসের।

২ ধনিক

তারা জানে আজকাল চলচে যা কিছু
সব ধনপতির হাতেই চলচে।

১ সৈনিক

সত্যি নাকি। এখনি দেখিয়ে দিতে পারি
তলোয়ার চলে আমাদেরি হাতে।

৩ ধনিক

তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্চে কে।

১ সৈনিক

চুপ্, দুর্ব্বিনীত।

২ ধনিক

চুপ করব আমরা বটে।
আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্চে
জলে স্থলে আকাশে।

১ সৈনিক

মনে ভাবচ আমাদের শতঘ্নী ভুলেচে তার বজ্রনাদ।

২ ধনিক

ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম
ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আরেক হাটে
সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।

১ নাগরিক

ওদের সঙ্গে পারবে না তর্কে।

১ সৈনিক

কী বলো, পারব না !

সব চেয়ে বড়ো তর্কটা ঝন্‌ঝন্‌ করচে খাপের মধ্যে।

১ নাগরিক

তোমাদের তলোয়ারগুলোর কোনোটা খায় ওদের নিমক,

কোনোটা খেয়ে বসেচে ওদের ঘুষ।

১ ধনিক

শুন্‌লেম নর্ম্মদাতীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল

দড়িতে হাত লাগাবার জন্যে। জানো খবর ?

২ ধনিক

জানি বৈকি।

রাজার চর পৌঁছল গুহায়

তখন প্রভু আছেন চীৎ হয়ে বুকে দুই পা আটকে।

তুরী ভেরী দামামা জগঝম্পের চোটে ধ্যান যদিবা ভাঙল

পা দুখানা তখন আড়ষ্ট কাঠ।

নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কী দাদা।

৬৫ বছরের মধ্যে একবারো নাম করেনি চলাফেরার।

বাবাজি বল্‌লেন কী।

২ ধনিক

কথা কওয়ার বালাই নেই।

জিবটার চাঞ্চল্যে রাগ করে গোড়াতেই সেটা ফেলেচেন কেটে।

ধনিক

তারপরে।

২ ধনিক

তারপরে দশ জোয়ানে মিলে আন্‌লে তাঁকে রথতলায়
দড়িতে যেমনি তাঁর হাত পড়া,
রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নীচে।

ধনিক

নিজের মনটা যেমন ডুবিয়েচেন রথটাকেও তেমনি
তলিয়ে দেবার চেষ্টা

২ ধনিক

একদিন উপবাসেই মানুষের পা চায় না চল্‌তে—
৬০ বছরের উপবাসের ভার পড়ল চাকার পরে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি

রথ পড়ল কেন মন্ত্রীমশায়।

মন্ত্রী

অনর্থপাত হলেই সর্ব্বাগ্রে তোমাকে স্মরণ করি।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার আমার দ্বারা তাই সম্ভব।

মন্ত্রী

মহাকালের রথ চলচে না।

ধনপতি

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল চাকায় তেল দিয়েচি
রশিতে টান দিইনি।

মন্ত্রী

মন্ত্র সব শক্তি আজ অর্থহীন,

তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক্।

ধনপতি

চেষ্টা করা যাক্।

দৈবক্রমে চেষ্টা যদি সফল হয় অপরাধ নিয়ো না তবে

( দলের লোকের প্রতি ) বলো সিদ্ধিরস্তু।

সকলে

সিদ্ধিরস্তু।

ধনপতি

লাগো তবে ভাগ্যবানেরা। টান দেও।

ধনিক

রশি তুলতেই পারিনে। বিষম ভারী।

ধনপতি

এসো কোষাধ্যক্ষ, ধরো তুমি কষে।

বলো সিদ্ধিরস্তু। টানো, সিদ্ধিরস্তু।

টানো, সিদ্ধিরস্তু।

২ ধনিক

মন্ত্রিমশায়, রসিটা যেন আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠল,

আর আমাদের হাতে হোলো যেন পক্ষাঘাত।

সকলে

দুয়ো দুয়ো।

সৈনিক

যাক্ আমাদের মান রক্ষা হোলো।

পুরোহিত

আমাদের ধর্ম্মরক্ষা হোলো।

সৈনিক

ধনপতি

ঐ সোজা কাজটাই জানো তোমরা।
মাথা খাটাতে পারো না, কাটতেই পারো মাথা।
মন্ত্রীমশায় ভাবচ কী।

মন্ত্রী

ভাবচি সব চেষ্টাই ব্যর্থ হোলো
এখন উপায় কী।

ধনপতি

এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল।
তাঁর নিজের ডাক যেখানে পৌঁছবে সেখান থেকে
বাহন আসবে ছুটে।
আজ যারা চোখে পড়ে না কাল তারা দেখা দেবে সব
চেয়ে বেশি।
ওহে খাতাঞ্চি, এই বেলা সামলাওগে খাতাপত্র—
কোষাধ্যক্ষ সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।
[ ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান।

মেয়েদের প্রবেশ

১মা

হাঁ গা, রথ চলল না এখনো, দেশশুদ্ধ রইল উপোষ
করে।
কলিকালে ভক্তি নেই যে।

মন্ত্রী

তোমাদের ভক্তির অভাব কী বাছা,
দেখি না তার জোর কত।

১মা

নমো নমো

নমো নমো বাবা দড়ি ঠাকুর, অন্ত পাইনে তোমার
দয়ার।

নমো নমো।

২য়া

তিনকড়ির মা বল্‌লে, সতেরো বছরেব ব্রাহ্মণের মেয়ে,
ঠিক দুক্ষুর বেলা, বোম ভোলানাথ বলে,
তাল পুকুরে—ঘাটের থেকে তিন হাতের মধ্যে—
একডুবে তিন গোছা পাট-শিয়ালা তুলে
ভিজে চুল দিয়ে বেঁধে দড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে
প্রভুর টনক নড়বে। জোগাড় করেচি অনেক যত্নে,
সময়ও হয়েচে পোড়াবার।
আগে দড়ি-বাবার গায়ে সিঁদূর চন্দন লাগা;
ভয় কিসের, ভক্তবৎসল তিনি—
মনে মনে শ্রীগুরুর নাম করে গায়ে হাত ঠেকালে
অপরাধ নেবেন না তিনি।

১মা

তুই দে না ভাই চন্দন লাগিয়ে, আমাকে বলিস্ কেন।
আমার দেওর পো পেটরোগা,
কী জানি কিসের থেকে কী হয়।

৩য়া

ঐ তো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠচে।
কিন্তু জাগলেন না তো।

দয়াময়!
জয় প্রভু, জয় দড়ি-দয়াল প্রভু, মুখ তুলে চাও।
তোমাকে দেবো পরিয়ে পঁয়তাল্লিশ ভরির সোনার আঙটি—
গড়াতে দিয়েচি বেণী স্যাকরার কাছে।

২য়া

তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেবো তিন বেলা।
ওলো বিনি, পাখাটা এনেচিস তো বাতাস কর্ না—
দেখ্‌চিস্‌নে রোদ্দুরে তেতে উঠেচে ওঁর মেঘবরণ গা!
ঘটি করে গঙ্গাজলটা ঢেলে দে।
ঐখানকার কাদাটা দে তো ভাই আমার কপালে মাখিয়ে।
এই তো আমাদের খেঁদি এনেচে খিচুড়ি ভোগ।
বেলা হয়ে গেল, আহা কত কষ্ট পেলেন প্রভু।
জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবদড়ীশ্বর
গড় করি তোমায়, টলুক তোমার মন।
মাথা কুটচি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন।
পাখা কর্ লো; পাখা কর্, জোরে জোরে।

১মা

কী হবে গো কী হবে আমাদের
দয়া হোলো না যে। আমার তিন ছেলে বিদেশে,
তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।

( চরের প্রবেশ )

মন্ত্রী

বাছাবা এখানে তোমাদের কাজ হোলো
এখন ঘরে গিয়ে জপতপ ব্রত নিয়ম করো গে।
আমাদের কাজ আমরা করি।

১মা

যাচ্ছি, কিন্তু দেখো মন্ত্রী বাবা,
ঐ ধোঁয়াটা যেন শেষ পর্য্যন্ত থাকে—
আর ঐ বিল্বিপত্রটা যেন পড়ে না যায়।

[ মেয়েদের প্রস্থান।

চর

মন্ত্রীমশায়, গোল বেধেচে শূদ্র পাড়ায়।

মন্ত্রী

কী হোলো!

চর

দলে দলে ওরা আসচে ছুটে, বলচে রথ চালাব আমরা।

সকলে

বলে কী। রশি ছুঁতেই পাবে না।

চর

ঠেকাবে কে তাদের? মারতে মারতে তলোয়ার যাবে ক্ষয়ে।

মন্ত্রীমশায়, বসে পড়লে যে।

মন্ত্রী

দল বেঁধে আসচে বলে ভয় করিনে—

ভয় হচ্চে পারবে ওরা।

সৈনিক

বলো কী মন্ত্রী মহারাজ, শিলা জলে ভাসবে?

মন্ত্রী

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়,

বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।

সৈনিক

আদেশ করুন কী করতে হবে, ভয় করিনে আমরা।

মন্ত্রী

ভয় করতেই হবে, তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা ঠেকানো যায় না।

চর

এখন কী আদেশ বলুন।

মন্ত্রী

বাধা দিয়োনা ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

চর

ঐ যে এসে পড়েচে ওরা।

মন্ত্রী

কিছু কোরো না তোমরা, থাকো স্থির হয়ে।

( শূদ্রদলের প্রবেশ )

দলপতি

আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।

মন্ত্রী

তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে আসচ চিরদিন।

দলপতি

এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়
দলে' গিয়ে ধূলোয় যেতুম চ্যাপ্‌টা হয়ে।
এবার সেই বলি তো নিল না বাবা।

মন্ত্রী

তাই তো দেখ্‌লেম।
সকাল থেকে চাকার সামনে ধুলোয় করলে লুটোপুটি—
ভয়ে উপরে তাকালে না, পাছে ঠাকুরের দিকে চোখ পড়ে—
তবু তো চাকার মধ্যে একটুও দেখা গেল না ক্ষুধার লক্ষণ।

পুরোহিত

এ'কেই বলে অগ্নিমান্দ্য,
তেজ ক্ষয় হলেই ঘটে এই দশা।

দলপতি

এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

পুরোহিত

রশি ধরতে ! ভারি বুদ্ধি তোমাদের। জান্‌লে কী করে।

দলপতি

কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।
ভোর বেলায় উঠেই সবাই বল্‌লে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর
ডাক দিয়েছেন বাবা।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি

না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত

বরাবর সংসার যারা চালায় রথের রশি তাদেরই হাতে।

দলপতি

সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর।

পুরোহিত

স্পর্দ্ধা দেখো একবার। কথার জবাব দিতে শিখেচে,
লাগল বলে ব্রহ্মশাপ।

দলপতি

মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার।

মন্ত্রী

সে কী কথা। সংসার বলতে তো তোমরাই।
নিজগুণেই চলো, তাই রক্ষে।
চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্চি।
আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

দলপতি

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচো,
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।

সৈনিক

সর্ব্বনাশ। এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেচে ওরা
তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক।
আজ ধরেচে উল্টো বুলি, এ তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী

( সৈনিকের প্রতি ) চুপ করো।
সর্দ্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই,
তোমরা নারায়ণের গরুড়।
এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।
তার পরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

দলপতি

আয় রে ভাই লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।

মন্ত্রী

কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো।
বরাবর যে রাস্তায় রথ চলেচে, যেয়ো সেই রাস্তা ধবে।
পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।

দলপতি

কখনো বড়ো রাস্তায় চল্‌তে পাইনি,তাই রাস্তা চিনিনে।
রথে আছেন যিনি তিনিই সাম্‌লাবেন।
আয় ভাই, দেখছিস্ রথচূড়ায় কেতনটা উঠচে দুলে।
বাবার ইসারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই। ঐ চেয়ে দেখ্‌রে ভাই,
মরা নদীতে যেমন বান আসে
দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁছেচে।

পুরোহিত

ছুঁলো, ছুঁলো দেখছি, ছুঁলো শেষে, বশি ছুঁলো পাষণ্ডেরা।

( মেয়েদের ছুটিয়া প্রবেশ )

সকলে

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা দোহাই বাবা,
ও গদাধর, ও বনমালী, এমন মহাপাপ কোরোনা।
পৃথিবী যাবে যে রসাতলে।
আমাদের স্বামী ভাই বোন ছেলে
কাউকে পারব না বাঁচাতে।
চল্ রে চল্, দেখলেও পাপ আছে।

[ প্রস্থান।

পুরোহিত

চোখ বোজো, চোখ বোজো তোমরা।
ভস্ম হয়ে যাবে ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্ত্তি দেখলে।

সৈনিক

একি, একি, চাকার শব্দ না কি—
না আকাশটা উঠল আর্ত্তনাদ করে।

পুরোহিত

হতেই পারে না—কিছুতে হতেই পারে না—
কোনো শাস্ত্রেই লেখে না।

নাগরিক

নড়েচে রে নড়েচে, ঐ তো চলেচে।

সৈনিক

কী ধূলোই উড়ল—পৃথিবী নিঃশ্বাস ছাড়চে।
অন্যায়, ঘোর অন্যায়। রথ শেষে চল্‌লো যে—
পাপ, মহাপাপ।

শূদ্রদল

জয় জয় মহাকালনাথের জয়।

সৈনিক

ঠাকুর, তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ চলা।
বৃদ্ধ হয়েচেন মহাকাল, তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হোলো
দেখলেম সেটা স্বচক্ষে।

পুরোহিত

সাহস হয় না হুকুম করতে।
অবশেষে জাত খোয়াতেই বাবার যদি খেয়াল গেল
এবারকার মতো চুপ করে থাকো রঞ্জুলাল।
আসচে বারে ওঁকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।
হবেই, হবেই, হবেই।
ওঁর দেহ শোধন করতে গঙ্গা যাবে শুকিয়ে।

সৈনিক

গঙ্গার দরকার হবে না।
ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেবো উড়িয়ে
ঢালব ওদের রক্ত।

নাগরিক

মন্ত্রীমশায়, যাও কোথায় ?

মন্ত্রী

যাব ওদের সঙ্গে রশি ধরতে।

সৈনিক

ছি ছি, ওদের হাতে হাত মেলাবে তুমি !

মন্ত্রী

ওরাই যে আজ পেয়েচে কালের প্রসাদ।
স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।

সৈনিক

তাই বলে ওদেরই এক সারে রশি ধরা।
ঠেকাবই আমরা, রথ চলুক আর নাই চলুক।

মন্ত্রী

এবার দেখচি চাকার তলায় পড়বার পালা তোমাদেরই।

সৈনিক

সেও ভালো। অনেককাল চণ্ডালের রক্ত শুষে চাকা
আছে অশুচি,
এবার পাবে শুদ্ধ রক্ত ! স্বাদ বদল করুক।

পুরোহিত

কী হোলো মন্ত্রী,—এ কোন্ শনিগ্রহের ভেল্‌কি !
রথটা যে এরি মধ্যে নেমে পড়েচে রাজপথে।
পৃথিবী তবু তো নেমে গেল না রসাতলে।
মাতাল রথ কোথায় পড়ে কোন্ পল্লীর ঘাড়ে কে জানে।

সৈনিক

ঐ দেখো,ধনপতির দল আর্ত্তনাদ করে ডাকচে আমাদের।

রথটা একেবারে সোজা চলেচে ওদেরি ভাণ্ডারের মুখে।
যাই ওদের রক্ষা কবতে।

মন্ত্রী

নিজেদের রক্ষার কথা ভাবো।
দেখচ না ঝুঁকেচে তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে।

সেনিক

উপায়।

মন্ত্রী

ওদের সঙ্গে মিলে ধর'-সে রশি।
বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে
দো-মনা করবার সময় নেই।

( প্রস্থান )

সৈনিক

কী করবে ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত

বীরগণ, তোমবা কী করবে বলো আগে।

সৈনিক

কী করতে হবে বল না ভাই সকল।
সবাই যে একেবাবে চুপ কবে গেছ।
রশি ধরব, না লড়াই করব।
ঠাকুর তুমি কী করবে বলই না।

পুরোহিত

কী জানি রশি ধরব, না শাস্ত্র আওড়াব।

সৈনিক

গেল, গেল, সব। রথের এমন হাঁক শুনিনি
কোনো পুরুষে।

২ সৈনিক

চেয়ে দেখনা, ওরাই কি টানচে রথ
না রথটা আপনিই চলেচে ওদের ঠেলে নিয়ে।

৩ সৈনিক

এতকাল রথটা চল্‌ত যেন স্বপ্নে—
আমরা দিতেম টান আর ও পিছে পিছে আসত
দড়ি-বাঁধা গোরুর মতো।
আজ চলচে জেগে উঠে। বাপ্‌রে কী তেজ।
মানচে না আমাদের বাপদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেচে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপর চড়ে বসেচে যম।

২ সৈনিক

ঐ যে আসচে কবি, ওকে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কী।

পুরোহিত

পাগলের মতো কথা বলচ তোমরা।
আমরাই বুঝলেম না মানে, বুঝবে কবি?
ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা—শাস্ত্র জানে কী?

কবিব প্রবেশ

২ সৈনিক

এ কী উল্টোপাল্টা ব্যাপার, কবি।
পুরুতের হাতে চল্‌ল না রথ, রাজার হাতে না,
মানে বুঝলে কিছু।

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নীচের দিকে নামল না চোখ,

রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন, তাকে
ওরা মানে নি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্চে
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিত

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান,
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয় তো।
একদিন ওরা ভাববে রথী কেউ নেই, রথের
সর্ব্বময় কর্ত্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই সুরু করবে চেঁচাতে
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরোহিত

তখন যদি রথ আর একবার অচল হয়
বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে—
তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর।
রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েচে বারে বারে।
কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারেনি সে পৌঁছতে।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চাল-চলন যার একপাশে বাঁকা ;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তাল-মানের উপর নয়।

সৈনিক

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চল্‌লে,
ওদিকে যে লাগল আগুন।

কবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক

তুমি কী করবে কবি।

কবি

আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক

কী হবে তার ফল ?

কবি

যারা টানচে রথ, তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা,
তখন ক্ষুদে ক্ষুদে খাল খন্দগুলো মারমূর্ত্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

মেয়েদের প্রবেশ

১মা

এ হোলো কী ঠাকুর। তোমরা এতদিন আমাদের
কী শিখিয়েছিলে।
দেবতা মানলে না পূজো, ভক্তি হোলো মিছে।
মানলে কিনা শূদ্দুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া।
ছি ছি কী ঘেন্না।

কবি

পূজো তোমরা দিলে কোথায়।

২য়া

এই তো এইখানেই।
ঘি ঢেলেচি, দুধ ঢেলেচি, ঢেলেচি গঙ্গাজল,—
রাস্তা এখনো কাদা হয়ে আছে।
পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি

পূজো পড়েচে ধুলোয়, ভক্তি করেচে মাটি।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে দেহে
প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেচে অপরাধ, বাঁধন হয়েচে দুর্ব্বল।

২য়া

আর ওরা, যাদের নাম করতে নেই ?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন

নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল

অতিশয় বেশি,

ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,

সেইখান থেকে মারলেন টান,

বড়োটাকে দিলেন কাৎ করে।

সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

১মা

তার পরে হবে কী।

কবি

তার পরে কোন্ এক যুগে কোন্ একদিন

আসবে উল্টোরথের পালা।

তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।

এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—

রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধূলোয় ফেলোনা,

রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়োনা কাদা করে।

আজকের মতো বলো সবাই মিলে,

যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক্ বেঁচে,

যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে

তারা দাঁড়াক্ একবার মাথা তুলে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

জয় মহাকালনাথের জয়।

---

# কবির দীক্ষা

আমি তো ভর্ত্তি হয়েছিলেম তোমার দলেই।

দৌড় দিলে কেন।

ভয়ে।

ভয় কিসের।

ভবভয়নিবারিণী সভার সভাপতি—

আহা পরম ধাম্মিক,—

বল্‌লেন আমাকে, ঐ লক্ষ্মীছাড়াটা—

থাম্‌লে কেন।
আমি জানি বলেচেন,
লক্ষ্মীছাড়াটা দিচ্চে তোমাকে রসাতলে।

একেবারে ঐ শব্দটাই,
রসাতলে।

অন্যায় তো বলেন নি।

বলো কী কবি।

জীবন আমার যাঁর সাধনায় মগ্ন
সেই দেবতা তলিয়ে আছেন অতলে—

খুড়ো জ্যাঠারা বলেচেন সবাই
তোমার দীক্ষায় না আছে অর্থের আশা,
না আছে পরমার্থের।

পণ্ডিত মানুষ তোমাব খুড়ো জ্যাঠারা,
বলেন ঠিক কথাই।

সর্ব্বনাশ তো তবে।

সত্য কথাটি বেরোলো মুখে,
সর্ব্বনাশ, ঐটের থেকেই সর্ব্বলাভ,
সর্ব্বনেশেই মন কেড়েচে কবির।

বুঝলেম কথাটা।
মিলচে তত্ত্বানন্দস্বামীর সঙ্গে।
শিবমন্ত্র দেন তিনি প্রলয় সাধনায়।

শিবমন্ত্র দিই আমিও।

অবাক করলে,
তুমি তো জানি কবি,
কবে হলে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা।

কেন বলো বেঠিক কথা।
তোমরা তো মেতে আছ নাচে গানে।

জগৎজোড়া নাচ গানেরই পালা আমাদের প্রভুর।
কী বলেন তত্ত্বানন্দস্বামী।

প্রলয় ছাড়া কথা নেই তাঁর মুখে।
তত্ত্বানন্দস্বামীর নাচ!
শুনলে গম্ভীর গণেশ
বৃংহিতধ্বনি করবেন অট্টহাস্যে।
ত্যাগের দীক্ষা নিয়েচি তাঁর কাছে।

যদি পরামর্শ দেন সবই ফুঁকে দিতে
তবে কী করবে ত্যাগ?
উপুড় করবে শূন্য ঘড়াটাকে?

তুমি কাকে বলো ত্যাগ, কবি।

ত্যাগের রূপ দেখো ঐ ঝর্‌নায়,

নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান।
নিজেকে যে শুকিয়েচে যদি সেই হোলো ত্যাগী,
তবে সব আগে শিব ত্যাগ করুন অন্নপূর্ণাকে।

কিন্তু সন্ন্যাসী শিব ভিক্ষুক, সেটা তো মানো।
মহত্ত্ব দিলেন তিনি জগতের দরিদ্রকে।

দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ত্ব মহৎ যিনি ঐশ্বর্য্যে।
মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়
আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।

ভরব কেমন করে তাঁর অসীম ভিক্ষার ঝুলি।

তিনি না চাইলে খুঁজেই পেতেম না দেবার ধন।

বুঝলেম না কথাটা।

কিছু তিনি চান নি কুকুর বেড়ালের কাছে।
অন্ন চাই বলে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে।
বেরোলো মানুষ লাঙল কাঁধে।
যে মাটি ফাঁকা ছিল প্রকাশ পেল তাতে অন্ন।
বললেন চাই কাপড়।
হাত পেতেই রইলেন,
বেরোলো ফলের থেকে তুলো,
তুলোর থেকে সুতো,
সুতোর থেকে কাপড়।

ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি অসীম
তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের।
নইলে দিন কাটত কুকুর বেড়ালের মতো।
তোমবা কি বলো সব চেয়ে বড়ো সন্ন্যাসী ঐ
কুকুর বেড়াল।
তত্ত্বানন্দস্বামী কী বলেন।

তিনি বলেন শিবের ভিক্ষাব ঝুলির টানে আমরা
হব নিষ্কিঞ্চন।
যার কিছু নেই দেবাব, তার নেই দেনা।
সংসাবের নালিশ একেবারে বন্ধ তার নামে।

মানুষকে যদি দেউলে করেন তিনি,
তবে ভিক্ষু দেবতার ব্যবসা হবে যে অচল।
তাঁব ভিক্ষেব ঝুলির টানে মানুষ হয় ধনী,
যদি দান করতেন ঘটত সর্ব্বনাশ।

তোমাব কথা শুনে বোধ হচ্চে মিথ্যে নয় পুরাণের
কথাটা।
ভিক্ষুক শিবের বরেই বাবণেব স্বর্ণলঙ্কা।
কিন্তু আগুন কেন লাগে সে লঙ্কায়।

সে যে কবলে ভিক্ষে বন্ধ। লাগল জমাতে।
দিতে যেমনি পারলে না, যেমনি লাগল কাড়তে
অমনি ঘটল সর্ব্বনাশ।
ভিক্ষু দেবতা দ্বারে বসে হাঁকেন, দেহি দেহি।

তবু আমরা কোণে বসে আছি নেংটি পরে।

দেবো কিই বা!

কেউ বা লোভে পড়ে ভাঙতে চায় না জমানো ধন।

তবে কি য়ুরোপখণ্ডকে বল্‌বে শিবের চেলা।

বলতে হয় বই কি।
নইলে এত উন্নতি কেন।
মেনেচে ওরা মহাভিক্ষুর দাবী।
তাই বের করে আনচে নব নব সম্পদ,
ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে।

অশান্তিও তো কম দেখচিনে ওদের মধ্যে।

যখন শিবের ভোগ ভেঙে নিজের দিকে চুরি করে,
উৎপাত বাধে তখন অশিবের।
ত্যাগের ধনে মানুষ ধনী, চুরির ধনে নয়।
আমরা কুঁড়ে, ভিক্ষুক দেবতাকে দিইনে কিছু।
তাই মরচি সব দিকেই,
ক্ষেতে ফসল যায় মরে,
পুকুরে জল যায় শুকিয়ে,
দেহে ধরে রোগ, মনে ধরে অবসাদ,
বিদেশী রাজা দেয় দুই কান মলে।
শিবের ঝুলি ভরব যেদিন সেদিন আমাদের সব ভরবে।

কিন্তু গোড়ায় বলছিলে যে রসের কথাটা

শিবের ঝুলিতে তো তার খবর মেলে না।

মেলে বই কি। গাছের ত্যাগ ফল দিয়ে।
ফল ফলে না রস না হলে।
প্রাণের ধনই হোলো আনন্দ, যাকে বলি রস।
যেখানে রসের দৈন্য,ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু।

শ্মশানে কেন দেখি তোমার ঐ দেবতাকে।

মৃত্যুতে তাঁর বিলাস বলে নয়, মৃত্যুকে জয়
করবেন বলে।
যে দেবতারা অমরাবতীতে
দ্বন্দ্বই নেই তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে।
মানুষের যিনি শিব
তিনি বিষপান করেন বিষকে কাটাবেন বলে।
ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও দ্বারে দ্বারে রব
উঠল তাঁর কণ্ঠে,
সে মুষ্টিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা।
নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস
তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান।
দুর্ব্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।